ধুর ব্যাঙ্!

অরিন্দম নাথ

ঘটনাটি বছর দু`য়েক আগের। সেবার শীত বসন্ত গ্রীষ্ম পেরিয়ে যেতে বসেছে। ত্রিপুরার আকাশে বৃষ্টির দেখা নেই। মেঘনাদবাবুও ভাবলেন প্রকৃতি তার ভারসাম্য হারাচ্ছে। নির্বিচারে বন ধ্বংস হচ্ছে। জুমচাষ ও নতুন বসতির কারণে মাটির সিক্ততা নষ্ট হচ্ছে। জলধারণ ক্ষমতা হারাচ্ছে। ভূমি-ক্ষয়ের ফলে নদীগুলি তার নাব্যতা হারাচ্ছেও। এত সবের পরও মেঘনাদবাবু আশাবাদী ছিলেন সহসাই বৃষ্টি নামবে। কারণ এখনও ত্রিপুরার ষাট শতাংশের বেশি ভূমি বনের শ্যামলিমায় আচ্ছাদিত। মেঘনাদবাবুর ধারনায় ভুল ছিল না। দিন কয়েকের মধ্যেই বৃষ্টি নামল। ব্যাপক আকারেই।

ঝড়-বৃষ্টির কারণে কয়েকদিন বিদ্যুৎ বিভ্রাটও ঘটল। স্থানীয় পত্রিকা প্রকাশনও কয়েকদিন অনিয়মিত হয়ে পড়ল। পরিস্থিতির একটু উন্নতি হলে হকার কয়েক দিনের পত্রিকা একসাথে দিয়ে গেল। একটি পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে ‘বেতছড়ায় বেঙ্গের বিয়ে’। শিরোনামটি পড়েই মেঘনাদবাবু স্বগোতোক্তি করলেন ‘ধুর ব্যাঙ্!’

অন্য সময় হলে মেঘনাদবাবু খবরটি পড়তেন। বেতছড়া গ্রামটি এখন উনকোটি জেলায়। এক সময় অবিভক্ত উত্তর ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত ছিল। মেঘনাদবাবু উত্তর জেলার বাসিন্দা। কু -সংস্কারে বিশ্বাস করেন না। তাই বেঙ্গের বিয়ে দিয়ে বৃষ্টি নামানোর দাবীতে তাঁর প্রতিক্রিয়া ‘ধুর ব্যাঙ্!’

তিনি বিষয়টি ভুলেই গিয়েছিলেন। কিন্তু প্রসঙ্গটি আবার ফিরে এল। নান্টু ঘটকের আগমনে। নান্টু ঘটকের বাড়ি বেতছড়ায়। নান্টু মেঘনাদবাবুর বন্ধু। বয়সে তার চেয়ে ছোট। মেঘনাদবাবু নান্টুকে পছন্দ করেন। খবরিলাল বা খবরের গেজেট। তার একটি পিতৃদত্ত নাম আছে। কিন্তু মেঘনাদবাবু তাকে নান্টু ঘটক বলেই ডাকেন। নান্টু বেঙ্গের বিয়ে খেয়ে এসেছে। শুধু খেয়ে আসাই নয় , বেঙ্গের বিয়ের মন্ত্রও লিখে এনেছে।

ব্যাঙ বইছে ঘাডঅ করিমগঞ্জের আডঅ ও বেঙ্গা,
মেঘ দেছ না ক্যায়্যা ॥
উড়ি পাতায় ছাইলাম ছানী তে-ও পড়ে না মেঘের পানি;
চাষারে- এক ফোঁটা মেঘ দেও রে খাই ॥
চাষার বৌয়ের নাক খালি মেঘ নামছে বাড়ি বাড়ি,
চাষারে- অরণ খরানে খাইল ধান ॥
চাষার বউয়ে পিনছে শাড়ী লামছে বাড়ি বাড়ি-,
চাষারে- অরণ খরানে খাইল ধান ॥
ডুলের বিচন ডুলে থইয়্যা চাষা রইল বইয়্যা,
চাষারে, অরণ খরানে খাইল ধান ॥

এ ছিল মঙ্গলাচরণের দিনের মন্ত্র। মেঘনাদবাবুর ধারণা বর -কণে সোনা-ব্যাঙ হবে। কারণ সোনা -ব্যাঙ জল পছন্দ করে। কিন্তু নান্টু বলল বর -কণে কোলা-ব্যাঙ। বিয়ে হয়েছে হিন্দু শাস্ত্রমতে। ফুল -শয্যা, কাল-রাত্রি, চতুর্থ-মঙ্গল প্রভৃতি সব আচার আচরণই পালন ক রা হয়েছে। বিরাট ঘরের ভিতর বর -কনেকে আটকে রাখতে কষ্ট হচ্ছিল। বিয়ের দিনের মন্ত্র ছিল।

বেঙ্গের ঝি`র বিয়াগো সোনার মুডুক দিয়া গো।
চল লো সখী বইন বিয়া খাই গিয়া,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কিয়া।
আম পাতা দিয়া ছাইলাম ছানী তেও না নামে মেঘের পানি,

চল লো সখী বইন বিয়া খাই গিয়া,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কিয়া।
কাডের বলদ বলদ কাডের শিং চইলাছে বলদ গাদলা দিন,
গাদলা দিনে বেঙ্গীর বিয়া-
চল লো সখী বইন বিয়া খাই গিয়া,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কিয়া।

বিয়ের দিন এবং চতুর্থ মঙ্গলে গ্রামবাসীরা খিচুরি সহযোগে ভোজ সারে। চতুর্থ মঙ্গলের রাত্রি থেকেই মু ষলধারে বৃষ্টি নামে। চতুর্থ মঙ্কলার মন্ত্র ছিল আরো জবরদস্ত।

বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
গিরস্থের অলদী দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥
বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
মেন্দীর পাতা দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥
বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
ডুমের কুলা দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥
বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
আবের কাঁকই দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥
বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
আবে আয়না দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥
বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
বাদাম তেল দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥

বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
জলে ভাসাও সাবান দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥
বেঙ্গের ঝি`র বিয়া গো,
রেশমী রুমাল দিয়্যা গো,
ও বেঙ্গি মেঘ দেছ না কেয়্যা ॥

এই বিয়ের পর থেকে গ্রামের যে দু`টি ঘর থেকে বর-কণেরা এসেছিল তারা নিজেদের বৈবাহিক বলে মানে। নান্টু ঘটকের কথায় মেঘনাদবাবু প্রভূত আনন্দ পান। তিনি চলে যান তাঁর ছোটবেলায়। উত্তর ত্রিপুরা জেলায় একটি প্রবাদ প্রচলিত ছিল। পেচকুন্দার বাসা ভাঙ্গলে বৃষ্টি আসে। পেচখুন্দা বা ফিঙে বা ভুজঙ্গ। ইংরেজিতে একে ব্ল্যাক ড্রঙ্গো বলা হয়৷ একে কতোবাল বা কোলসাও বলা হয়। মেঘনাদবাবু এই দু`টি ঘটনার পেছনে বৈজ্ঞানিক কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন।

মেঘনাদবাবুর একটি জনশ্রুতি মনে আসে। একবার পাখিরা ঠিক করল মানুষের মত তারা রাজা নির্বাচন করবে। মিটিং করে সিদ্ধান্ত হল , আকাশে যে সবার উপরে উঠতে পারবে তাকেই রাজা মানা হবে। সেই অনুযায়ী একদিন সকালে পাখিদের রাজা নির্বাচন শুরু হল৷ শরৎকাল। আকাশ পরিষ্কার। এক টুকরো মেঘ নেই। হাওয়া বইছে ফুরফুরে। ঝলমল করছে রোদ্দুর। পাখিরা ওড়া শুরু করল। টুনটুনি, বুলবুলি, বাজ, চিল, শকুন, ময়না, টিয়া, দোয়েল সবাই উড়ল। ফিঙেও উড়ল। তবে শকুনের পিঠে চেপে। শকুন টেরও পেল না। শকুনই সবচেয়ে উপরে উঠেছিল। তার পিঠে ফিঙে। তারপর ক্লান্ত হয়ে পাখিরা একে একে নেমে এল। ফিঙে তখন শকুনের পিঠ থেকে ডানা মেলে উড়ল। পাখিরা দেখল সবার শেষে চক্কর দিয়ে নামছে ফিঙে। তাকে সবাই রাজা বলে মেনে নিলো৷ ফিঙে পাখিদের মধ্যে সবচাইতে তেজি। নিজের আকারের চেয়ে বড় কাক কিংবা বাজ পাখিকেও তাড়া করতে পিছপা হয় না।

ফিঙে মানুষের উপকারী পাখি। কীট -পতঙ্গ খেয়ে আমাদের ফসল রক্ষা করে। গ্রীষ্মে অতিরিক্ত খরার শেষে সন্ধ্যায় যখন উঁই পোকা বেরিয়ে আসে তখন ফিঙে মহা আনন্দে ভোজ বসায়। আসলে বাতাসে আর্দ্রতা বাড়লেই উঁই উড়ে। আবার অতিরিক্ত বৃষ্টির পর যখন উঁই উড়ে তখন বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যয়। গ্রামীণ মানুষ লক্ষ্য করেছে খরার পর যখন ফিঙেরা যখন মহা হই চই করে, তার পরপরই বৃষ্টি হয়। যেহেতু ফিঙেরা অনেক উপরে উঠতে পারে তাই বাতাসের আর্দ্রতার আগাম আঁচ পায়। বৃষ্টির জন্য অধৈর্য হয়ে লোকেরা ফিঙের বাসা ভেঙ্গে দে য়। তখন ফিঙে মহা হই চই জুড়ে দেয়। কাকতালীয় ভাবে হয়তো কখনো বৃষ্টি এসে পড়ে। ব্যাঙ্গের ক্ষেত্রেও তেমনি বাতাসের আর্দ্রতা ব্যাঙ্গ টের পায়৷ খনার বচনেও আছে ব্যাঙ ডাকলে বৃষ্টি আসে। সেই থেকেই ‘ধুর ব্যাঙ্!’